ATMADEEP

An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-III, January, 2026, Page No. 647-655
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.03W.254

বাংলার ঘর-গৃহস্থালি ও চাকর-বাকর: দাসবৃত্তির ইতিহাস ও পরিণতি বিষয়ক একটি তথ্যগত সংক্ষিপ্ত আলোচনা

তুলিকা বণিক, *গবেষক, ভারতীয় তথ্যপ্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান, গুয়াহাটি, অসম, ভারত*

Received: 01.12.2025; Accepted: 20.12.2025; Available online: 31.01.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

This paper critiques the history, structure, and socio-cultural implications of domestic servitude in colonial Bengal, situating it within global patterns of household labour. This discussion highlights how servants historically mediated the macro-structures of political and economic power and the micro-structures of everyday domestic life. The essay examines how industrialisation, demographic shifts, and the spread of Victorian ideals reshaped household arrangements in India during the nineteenth century.

The analysis traces India's older traditions of servitude—from epic literature, temple culture, and feudal households—to the emergence of "jhī–chākar" as a regular presence in middle-class Bengali homes. It demonstrates how caste, gender, religion, region, and racial hierarchies structured the recruitment and treatment of servants, producing multilayered inequalities even within servant groups. It explores how domestic work, especially for women, often involves not only physical labour but also sexual vulnerability, reinforced by the employer's social and economic power. To theorise servitude in this paper, the essay draws on literary and cinematic examples from Rabindranath Tagore's memoirs as well as Bengali films such as Deya-Neya, Puja, and Galpo Holeo Sotyi. It explores the cultural representation of servants as comic figures, romantic impossibilities, loyal caregivers, and even moral agents. These portrayals underscore the tension between dependency and distance characterising servant–master relationships, and unspoken hierarchies that continue to shape contemporary domestic labour in South Asia.

Keywords: Servant, Master, Domestic servitude, Inequality, Hierarchy

মাইকেল টসিগ ও অ্যান রাব্বোর ভাষায় "Servants become the essential link between macro-structure of political life and the micro-structure of domestic and personal experience which prepares and sustains people for their roles in society." (টসিগ ও রাব্বো, ৫-৬) অর্থাৎ এই বৃহত্তর সামাজিক পরিকাঠামোতে চাকর বা দাস একটি প্রয়োজনীয় সংযোগ মাধ্যম। তবে এই প্রয়োজনীয়তার সূচনাবিন্দু কিরূপ বা কিভাবে এই প্রয়োজনীয়তা সকল মানুষের রন্ধে একইসাথে কিন্তু বিভিন্ন ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তার আলোচনা করা দরকার। তবে এই গৃহকর্ম ও গৃহকর্মীর প্রয়োজনীয়তা মূলত বিশ্বব্যাপী (world-wide pattern of domestic service) (রোলিনস, ৪৪) এবং এই ব্যবস্থাপনা ধারাবাহিকভাবে চলে আসছে বিভিন্নভাবে এবং বিভিন্নধারায়। তবে ভারতবর্ষে প্রাথমিকভাবে এই দাসব্যবস্থা

এবং পরবর্তীতে গৃহকর্মীর নিয়োগ প্রভৃতির সূত্রপাত কখন ও কিভাবে, সেই ইতিহাস ঘাটলে একটি নির্দিষ্ট সময়কাল নির্ধারণ করা এবং ঠিক কি কারণে বা কোন প্রভাবে এই প্রভু-দাস সম্পর্কের উত্থান তা নির্ণয় করা বেশ কঠিন। রসতত্ত্বের বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে তাতে 'দাস্য' একটি গুরুত্বপূর্ণ রস এবং এই রসের গুরুত্ব কিরূপ তা *রামায়ণে* রাম-হনুমানের সম্পর্কে দৃশ্যমান। এমনকি বর্ণাশ্রমপ্রথানুযায়ী সমাজের একশ্রেণীর মানুষ (ঋকবেদানুসারে কার্যসূত্রে এবং উপনিষাদানুসারে জন্মসূত্রে) আগাগোড়াই সমাজের অন্যশ্রেণীর মানুষের পরিচর্যা ও সেবায় লিপ্ত ছিল। তবে সময়ের সাথে সাথে সমাজের এই পিরামিডাকৃতি কাঠামোর মজ্জাগত ও গঠনভিত্তিক বিপুল পরিবর্তন ঘটে চলেছে এবং এই ঘটমান পরিবর্তনই দাসব্যবস্থার আদিমসত্ত্বার আমূল কিছু পরিবর্তনের জন্য বিশেষভাবে দায়ী।

এই লেখনি তাই মূলত উনিশ শতকের গোড়ার দিকে ঔপনিবেশিক বাংলার গৃহকেন্দ্রিক দাসব্যবস্থা, বিশেষত গৃহকর্মী (তৎকালীন সমাজে 'ঝি-চাকর') ও সমাজে তাদের অবস্থান ইত্যাদি সম্পর্কিত বিবিধ তথ্যের বিশ্লেষণাত্বক একটি দলিল। সেই সময়ে এই প্রভু ও দাসের সম্পর্ক কিরূপ ছিল এবং কিভাবে তা সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক পরিকাঠামোকে প্রভাবিত করে তা আলোচনা করা এই লেখনীর অন্যতম এক উদ্দেশ্য। এই লেখনীতে প্রাথমিক ভাবে শিল্পায়ণ ও তার প্রভাবে ঔপনিবেশিক ভারতে দাসব্যবস্থার গতিবিধির পরিবর্তন, দাস বলে তৎকালীন বাংলায় কি বোঝা হত, তাদের অবস্থানগত তারতম্য, প্রকৃতি ও সাহিত্যে বা পপুলার কালচারে তার কি প্রতিমূর্তি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে তার একটি আলোচনা তুলে ধরা হল।

শিল্পায়ণ, সমাজ ও দাস:

ডেভিড চ্যাপলিন তাঁর বই *ডমেস্টিক সার্ভিস এন্ড ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইসেশন: কম্পারেটিভ স্টাডি অফ সোশিওলজি-*তে দাস ও শিল্পায়ণের যোগসূত্র নিরিখে পাঠকদের জন্য কিছু প্রশ্ন তুলে ধরে তার যথাযথ উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। তিনি প্রশ্ন করেছেন যে দাসব্যবস্থা প্রাক-শিল্পায়ণের ফসল কিনা কিংবা তাই যদি হয় তাহলে শিল্পায়ণ, মূলত ইউরোপের ক্ষেত্রে (১৭৮০র দশক-১৮৪৯) অর্থনৈতিক যে পরিবর্তন এনেছিল তার সাথে সামন্তরিক কিনা। শিল্পায়ণ ও প্রাক-শিল্পায়ণের সময় চলতে থাকা অর্থনৈতিক দোলাচল, বাজার মন্দা প্রভৃতির কারণে যদি দাসব্যবস্থার বিস্তার হয়ে থাকে তাহলে তা কি ক্ষণস্থায়ী অর্থাৎ অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটলে কি দাসব্যবস্থা মুছে যাবে? যদি দাস ব্যবস্থা বিলুপ্ত হয় সেক্ষেত্রে যারা অন্যের চাকর বা দাস হিসাবে বহুকাল নিযুক্ত থাকলো তাদের কর্মসংস্থানের নিশ্চয়তা কিরূপ? (চ্যাপলিন, ১২৭)

ইউরোপে শিল্পায়ণের হাত ধরে অর্থনীতির যে ঋণাত্বক পরিবর্তন অষ্টাদশ শতকের প্রথম ভাগে এসেছিল, তার সূত্রপাত বলা চলে ইউরোপে ঘটে যাওয়া বিপুল জনচ্ছাস। (১৭৫০ থেকে ১৮০০) সমগ্র মহাদেশে, বিশেষত ব্রিটেনে শতকরা মোট পঞ্চাশ থেকে নব্বই ভাগ জনসংখ্যা বৃদ্ধির নজির পাওয়া যায়। খাদ্যসংকট, মহামারি, দুর্ভিক্ষের কারণে নাজেহাল ইউরোপীয়বাসী তখন গ্রাম থেকে উঠে এসে ভিড় জমাতে লাগল শহরের বুকে কাজের আশায়। একে একে কারখানা গড়ে উঠলন। নানা পেশায়, মূলত দিনমজুর ও বেগার-খাটুনে হিসাবে মানুষ কাজে লাগতে শুরু করলো এবং ফলস্বরূপ উৎপাদনের হার বৃদ্ধি পেল, তখন অর্থনৈতিক অবস্থার ধণাত্বক পরিবর্তন হতে দেখা গেল যাকে বিখ্যাত ঐতিহাসিক ও অর্থনীতিবিদ আর্নল্ড টবি (১৮৫২-৮৩) নাম দিলেন ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশন। ইউরোপে বেড়ে ওঠা এই উন্নয়নের ছাপ ধীরে ধীরে পড়তে শুরু ভারত সহ ইউরোপের অনান্য উপনিবেশগুলিতেও। ভারতে দাসব্যবস্থার বীজ আগাগোড়াই রোপিত ছিল এবং ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি আসার পর, চা-কর্মী, নীলচাষী, জাহাজের খালাসী, কুলি প্রভৃতি বিভিন্ন পরিচয়ে, বিভিন্ন কাজের বাবদে প্রচুর মানুষকে পরিযায়ী শ্রমিক হিসাবে একজায়গা থেকে অন্য

জায়গায় আদান-প্রদান করা হয়। তবে আফ্রিকাতে যেভাবে দাস হিসাবে মানুষ কেনা-বেচার প্রথা চালু ছিল, তা ভারতের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ছিল না তাই লিখিতরূপে ভারতীয় দাসবৃত্তির নজির খানিক কম। তবে গৃহস্থালির কর্মে নিপুণা সাহায্য কর্মী বা ততকালীন বাংলায় চাকর হিসাবে পরিচিত মানুষদের জীবনযাত্রা বিষয়ক কিছু লেখাপত্র আছে।

সেই সকল দলিল ঘাটলে দেখা যাবে ঘরের কাজ করার জন্য নিযুক্ত মানুষের উল্লেখ সেই মহাকাব্যের সময় থেকেই পাওয়া যায়। এমনকি গুরুকূলে শিষ্যরা তাদের গুরু ও গুরুমাতাকে সাহায্য করার জন্য ঘর-গৃহস্থালির কাজকর্ম ও গুরুর সেবায় নিজেদের নিযুক্ত রাখত। এছাড়া সুলতান-রাজাদের হারেম কিংবা প্রাসাদেও দাস-দাসীরা থাকত। এমনকি হিন্দু মন্দিরে দেবদাসীর উপস্থিতি বিষয়েও নানা তর্ক-বিতর্ক পরবর্তীতে উঠে আসে। খুব খেয়াল করলে দেখা যাবে এই দাস-দাসীর বিলাসিতা মূলত সীমাবদ্ধ ছিল প্রতিষ্ঠিত শ্রেণীর মহলে। সাধারণ মানুষের এই বিলাসিতার সুযোগ ছিলনা। কিন্তু ভারতে তথা বাংলায় উনিশ শতকের অন্তিমভাগে স্বল্প সম্ভ্রামশালী ঘরে একটি করে ঝি বা চাকর রাখার যে প্রবণতা দেখা যায় তা মূলত ইউরোপীয় জীবনযাত্রার অন্যতম প্রভাব। ইংরাজী সাহিত্যের ইতিহাসে যাকে বলা হয় ভিক্টোরিয়ান এজ (১৮৩৭-১৯০১), সেই সময়কার সাহিত্যে "longing" অর্থাৎ অপেক্ষা একটি খুব গুরুত্বপূর্ণ আখ্যানবস্তু। ডেভিডঅফ এবং হলের মতে উনিশ শতকের মধ্যভাগে পশ্চিমে "the separation of sphere", (ডেভিডঅফ, ৪১৫-৪২৮) যার আক্ষরিক অনুবাদ "পরিমন্ডলের প্রভেদ", নামক একটি নতুন ধারণার জন্ম হয়। পারিমান্ডলিক এই বিভাজন মূলত গাঠনিক ভাবে দুটি ভাগে বিভক্ত: প্রথমত, "private space" বা ব্যক্তিগত ক্ষেত্র ও দ্বিতীয়ত, "public sphere" বা সামাজিক ক্ষেত্র। ফার্স্ট ওয়েভ ফেমিনিসমের আগে অবধি এই ব্যক্তিগত ক্ষেত্রটি সংরক্ষিত ছিল মহিলাদের জন্যে। তবে তাদের বিশেষ কিছু করণীয় কাজকর্ম ছিল না। তাই ভিক্টোরিয়ান সাহিত্যের প্রথমার্ধের নায়িকাদের জীবনে অপেক্ষা ও একাকিত্ব বিশেষ জায়গা করে নিয়েছিল। তাদের ঘরের কাজকর্ম থেকে শুরু করে নবজাত শিশুর পরিচর্যা করা অবধি সকল কাজ করার জন্যই নিযুক্ত থাকত বিভিন্ন স্তরের চাকরেরা। শুধু ইউরোপের সাহিত্যের উদাহরণ দিলে লেখাটি অসমাপ্ত থেকে যাবে কারন ঘর কে বাদ দিয়ে আলোচনা করা একপ্রকার বৃথা। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর *জীবনস্মৃতি*-র *ঘর ও বাহির* প্রবন্ধে বলেন "আমাদের শিশুকালে ভোগবিলাসের আয়োজন ছিল না বলিলেই হয়। মোটের উপরে তখনকার জীবনযাত্রা এখনকার চেয়ে অনেক বেশি সাদাসিধা ছিল। তখনকার কালের ভদ্রলোকের মানরক্ষার উপকরণ দেখিলে এখনকার কাল লজ্জায় তাহার সঙ্গে সকল প্রকার সম্বন্ধ অস্বীকার করিতে চাহিবে। এই তো তখনকার কালের বিশেষত্ব, তাহার পরে আবার বিশেষভাবে আমাদের বাড়িতে ছেলেদের প্রতি অত্যন্ত বেশি দৃষ্টি দিবার উৎপাত একেবারেই ছিল না। আসলে, আদর করা ব্যাপারটা অভিভাবকদেরই বিনোদনের জন্য, ছেলেদের পক্ষে এমন বালাই আর নাই।" ঠাকুর পরিবারের উচ্চ-মনস্ক জীবনধারা বজায় রাখার একটি অন্যতম উপাদান। তাদের কাজ ছিল পিতা-মাতার মতন ছোট্ট রবিসহ বাকি বাচ্চাদের শাসন করা, তাদের খাওয়া-পড়া ও অনান্য সকল প্রয়োজনীয়তার খেয়াল রাখা, "বাহির বাড়িতে দোতলায় দক্ষিণপূর্ব কোণের ঘরে চাকরদের মহলে আমাদের দিন কাটিত।" তবে এই খেয়াল রাখার সাথে পিতা-মাতার তাদের সন্তানের প্রতি খেয়াল রাখার মধ্যে পার্থক্য থেকেই যেত কারণ যে স্নেহ মা-বাবা তাদের সন্তানকে দিতে পারে তার সাথে ভৃত্যের দায়িত্ব পাল্লনের মধ্যে তফাত থেকেই যায়। তাই সন্তানের সাথে তার বাবা-মায়ের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে উঠত না কখনই। রবীন্দ্রনাথ এই দুরত্বকে তাঁর বেড়ে ওঠার পথের পাথেয় করে তুললেও বহু শিশুদের কাছে তাদের শৈশ্যব ও কিশোরকাল যথেষ্ঠ বেদনাদায়ক ছিল। তবে চাকরদের জীবনও বেশ বিলাসবহুল ছিল বা তাদের কাছে মালিকের সন্তানের দায়িত্ব ছিল বলে তারা যে বিশেষ কোনো সুযোগ-

সুবিধার প্রাপ্ত করত তা একেবারেই নয় কারণ বাস্তব জীবনেও এই সকল সাহায্যকারীদের কথাবার্তা বা জীবনযাপন ছিল অত্যন্ত সাদামাটা আর একঘেয়ে কারণ তাদের জীবনের অস্তিত্ব কেবল তাদের প্রভুদের বাড়ির আঙিনায় সীমাবদ্ধ ছিল। (ডাডেন, ১১৫) সামাজিক ক্ষেত্রে তাদের কোনো অস্তিত্ব কখনোই নজর কাড়েনি। এমনকি বাড়ির বাইরে কোন উৎসবে যখন বাড়ির মহিলারা পুরুষদের সাথে যোগদান করতো অর্থাৎ বলা চলে ব্যক্তিগত ক্ষেত্রের একটি ভাগ যখন সামাজিক ক্ষেত্রের সাথে খানিক হলেও মিলিত হত, তখনও মনিবেরা তাদের চাকরের নাম ধরে ডাকা দূর তাদের সাথে কথাও বলত না কারণ বাড়ির চাকরের সাথে কথা বলাতে মনিবের অস্তিত্বহানী ঘটতে পারে: “do make it a strict rule not to talk to servants and housekeeping when you go out…” (ম্যাকমিলান, ৮৮)

উল্লেখিত এই নিয়মের একটি উল্লেখযোগ্য উদাহরণ হিসাবে বর্তমানের একটি ফেসবুক পেজ, “Koi-hai tea-Planters Assam, Darjeeling and North-East India”- এর কথা বলা যাক। এই ফেসবুক পেজটি ২০১৯ সালে ২২ শে ফেব্রুয়ারী খোলা হয়েছে এবং কুড়ি হাজারেরও বেশি মানুষ এই গ্রুপের মেম্বার হয়েছে। এই মেম্বাররা মূলত দার্জিলিং, আসাম ও উত্তর-পশ্চিম ভারতের কিছু মানুষ যাদের পূর্বপুরুষ ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানির চা-এস্টেটের মনিবের নিজস্ব ভৃত্য ও চা-কর্মী। এই গ্রুপের মেম্বাররা মূলত তাদের কাছে সঞ্চিত তাদের পূর্বপুরুষদের পুরোনো চিঠিপত্র, ছবি বা তাদের মুখে শোনা জীবনের গল্প প্রভৃতি পোস্ট করার মাধ্যমে নিজেদের মধ্যে সংযোগ বজায় রাখে এবং তথ্য সংরক্ষণের কাজ করে থাকে। ফেসবুক পেজটির এই অসাধারণ নামটির পিছনের ইতিহাসই ডেভিডঅফের সেই পারিমান্ডিলিক বিভাজনের নজির। চা-এস্টেটের সেই মনিবেরা তাদের ভৃত্যদের কখনই নাম ধরে ডেকে কাজের হুকুম দিত না কারণ সাদা চামড়ার মনিবের মুখে, তাদের ভাষায় “নেটিভ” চাকরের নামও যদি উচ্চারিত হয় সেক্ষেত্রেও মনিবের সম্মানহানি হতে পারে। তাই তারা “koi hai” বা কেউ আছে বলে সম্বোধন করত। এই সম্বোধনের পিছনের উদ্দেশ্য এটাই যে তাদের আপ্যায়নের জন্য কাউকে না কাউকে মজুত থাকতেই হবে। এই “koi hai” -এর উত্তর তাই অবধারিত ভাবে “জি হুজুর”-ই ছিল, কখনই এই ডাকের প্রতিউত্তর নেতিবাচক হয়নি।

কর্মচারী, ভৃত্য ও তাদের অবস্থানগত বিভেদ ও বিরোধ:

ভিক্টোরিয়ান সংস্কৃতির প্রতিবিম্ব স্বরূপ যখন ভারতে তথা বাংলায় প্রতিফলিত হয় তখন সম্ভ্রম পরিবারে এবং বাবু সম্প্রদায়ের নিজেদের কাজ গুছিয়ে ও এগিয়ে দেওয়ার জন্য ভৃত্য নিয়োগ করার প্রচলন শুরু হয়। বলা বাহুল্য এই সমাজে মানুষের অবস্থানগত প্রভেদ আদিম কাল থেকে চলে আসছে এবং এই প্রভেদ আগাগোড়াই সামাজিক স্তরবিন্যাসকে আরও বড়ো করে তোলে। সমাজে সকলশ্রেণীর মানুষদের সমান অধিকার ও সমতা বজায় রাখা সম্পর্কিত মার্ক্সবাদী যে ধারণা প্রবর্তিত হয়, সেই ধারণাকে এই মনিব-ভৃত্য প্রথা সম্পূর্ণ রূপে নস্যাৎ করে। বরং ভৃত্য থাকলে তবেই সমাজে নিজেদের স্থান আরও উচ্চত্তরও হবে এমন এক ধারনা সকলের মনে দানা বাঁধতে শুরু করে। (হানসেন)

তবে কোন চাকর কি কাজ করবে এবং তাদের অবস্থান কিরূপ হবে তা নির্ণয় করা শুরু হয় কিছু শর্তানুযায়ী, যেমন- জাত, জাতি, ধর্ম, গায়ের রঙ, লিঙ্গ, উপনিবেশিত হলে তার অবস্থান কিরূপ, সে গ্রাম নাকি শহর থেকে বিরাজ করে প্রভৃতি: “Grounded in satisfaction, domestic service was always composed of people considered inferior (by virtue of their unfree status, their gender, their geographic origins, their lower-class background and/oer their caste, race and ethnicity) and always held in the lowest esteem.” (রলিনস, ৫৮)। শিল্পায়ণের সাথে সাথে যেহেতু কর্মসংস্থানের বহু পন্থা সূচিত হয় তাই বুঝে নেওয়া দরকার যে কর্মচারী (employee) ও সাহায্যকর্মী বা ভৃত্যের

(servant) মধ্যে কিপ্রকার পার্থক্য রয়েছে। বলা বাহুল্য যে এই পার্থক্য মূলত শ্রেণীগত। অর্থাৎ কারখানার কর্মচারী, দরবার ও কাছারির কর্মচারী বা নিজস্ব সহকারীর শ্রেণীগত যোগ্যতা ভৃত্যের তুলনায় বেশি। এই শ্রেণী নির্বাচন আবার পূর্বল্লেখিত শর্তাবলি অর্থাৎ জাত, জাতি, ধর্ম প্রভৃতির উপর নির্ভর করে। সুতরাং দপ্তরের কর্মচারী শুধু শিক্ষাগত যোগ্যতা থাকাই যথেষ্ট নয় বরং বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাঁকে অনান্য শর্তাবলির অধীনে এসে নিজেকে প্রমাণ করতে হবে। কর্মচারী ও ভৃত্যের এই অবস্থানগত প্রভেদ যথেষ্ট স্পষ্ট তবে এর চেয়েও বেশি স্বচ্ছ হয়ত ভৃত্যদের অভ্যন্তরীণ অবস্থানগত পার্থক্য এবং তাদের সাথে তাদের মনিবের সম্পর্ক যা মূলত এই অবস্থানের তুলনামূলক বিভেদপ্রসূত (কক): " …the relationship to the master or mistress was one based primarily on status and not on contract." (অবার্ট, ১৫২) অর্থাৎ মনিব কোন ভৃত্যের সাথে কিরূপ সম্পর্ক বজায় রাখবে তাও নির্ভর করবে ভৃত্যদের নিজস্ব শ্রেণী পরিচয়েয় উপর যেখানে তাদের কৃত কাজের পরিমাণও অনেক সময় লঘু হয়ে দাঁড়ায়। একটি সাধারণ উদাহরণ সহযোগ এই সম্পর্কগত প্রভেদ আরো বিস্তারিত আলোচনা করা যাক।

হিন্দু প্রতিপত্তিশালী পরিবারে রান্না করার জন্য যে ঠাকুর রাখা হত তা মূলত গরীব ব্রাহ্মণ বা অপেক্ষাকৃত নিম্মপদস্থ ব্রাহ্মণকে রাখা হত এবং যাকে সাহায্য করার জন্য থাকত তার এক বা একাধিক সহকারী। অর্থাৎ রান্নার গুণ-মান, পদ বা আয়োজন প্রভৃতি বিষয়ক আলোচনা মনিব মূলত করবে ব্রাহ্মণ ঠাকুরের সাথে এবং সেই ঠাকুরের নিয়ম ও নির্দেশানুসারে তাঁর সহকারীরা প্রভূত কার্য করবে। এমনকি এই ব্রাহ্মণরা কোনো ইউরোপীয়দের রন্ধনশালায় ঢুকেও রান্না করত না কারণ সেক্ষেত্রে কিছু বিশেষ খাদ্যের সাহচর্যে তাঁরা নিজেদের ধর্ম হারানোর শঙ্কা করত। ঘরের বাসি কাজকর্ম, ঘর ঝাড়-পোছ্য করা, জামা-কাপড় ধোয়া প্রভৃতির জন্য থাকত আলাদা চাকর। তারা কেবল এই সকল বাসী কাজ করারা জন্যই নিযুক্ত ছিল। তবে তারা মৃত পোষ্যের দেহ পরিষ্কার করত না, তার জন্য আসত আলাদা জমাদার এবং তাদের বাড়িতে প্রবেশের রাস্তাও ছিল ভিন্ন। মূলত বাড়ির সম্মুখ দ্বার দিয়ে কখনো জমাদার বাড়িতে প্রবেশ করতে পারত না, খিড়কির দরজা বা বারান্দার দরজা ছিল তাদের জন্য বরাদ্দ। এই জমাদার মূলত দলিত এবং সমাজে পিছিয়ে রাখা মানুষজনই ছিল।

তবে মহিলা ভৃত্যদের ক্ষেত্রে এই স্তরভেদ অন্যরকম ভাবে কাজ করতো। ১৯৭০ সালে আমেরিকায় এক মিলিয়নের বেশি গৃহস্থালির কর্মনিপুণা ভৃত্যদের মধ্যে শতকরা নব্বই ভাগই ছিল মহিলা যাদের পরিবার নয়তো কোনো বিপর্যয়ে বিদ্ধস্ত হয়ে গিয়েছিল কিংবা পরিযায়ী শ্রমিকে রূপান্তরিত হয়েছিল। (শ্রীনিবাস, ২৭১) সাউথ আফ্রিকায় মূলত কালো মহিলারাই ছিল সাদা চামড়ার উপনিবেশকারীদের বাড়ির কাজের লোক। (*দ্য ইকোনমিস্ট*) বাংলার ক্ষেত্রেও এর অন্যথা হয়নি বললেই চলে। পুরুষ চাকরদের সাহায্য করার জন্য ঠিকে ঝি রাখার প্রবৃত্তি জন্মে ছিল অনেক পরিবারেই। এদের কাজ ছিল ঘর-বাড়ি পরিস্কার রাখা সহ আরো নানা কাজে বাড়ির মহিলাদের সাহায্য করা। অপেক্ষাকৃত ধনী পরিবারে অবশ্য মহিলাদের অন্তরমহলে তাদের সাহায্য করার জন্য, সাজ-পোষাক তৈরি করার জন্য, কেশচর্চা কিংবা পান সেজে দেওয়ার জন্য থাকত আলাদা আলাদা ঝি। তবে বাংলায় মালকিন ও তাঁর ঝি-এর সম্পর্কের সমীকরণ ভিক্টোরিয় আদলের ছিল না। বরং কিছুক্ষেত্রে এই ঝি-রা হয়ে উঠত অন্তরমহলের মহিলাদের প্রাণের দোসর। কিন্তু তফাৎ তবুও থেকেই যায়। গিলের ভাষায় অন্তরমহলের এই ঝি-দের অস্তিত্ব খানিক সংকটময় ছিল, তারা সেই অর্থে কায়িক পরিশ্রমী চাকরও ছিলনা আবার অন্তরমহলে তারা নিজেদের মর্জির অধীনস্থও ছিলনা। তারা তাদের বেতনের বাইরে গিয়েও অনেকসময় মহিলাদের ছেলেপুলে দেখাশোনা করা থেকে শুরু করে তাদের বড় করে তোলার কাজও করে যেত কিন্তু ফলস্বরূপ তাদের প্রাপ্তি কিছুই হতনা, অর্থাৎ সন্তানকে মায়ের পরিচর্চা দিয়ে বড়ো

করে তুললেও মায়ের অধিকার দাবি তারা কখনোই করতে পারেনি: "...the house-worker is neither a labourer in the traditional sense nor one who carries out the unpaid domestic tasks of wife or mother." (গিল, ১২৮)

মহিলা ভৃত্য বা দাসী কিংবা ঠিকে ঝি-দের নিয়োগ করা হত তাদের বয়স, অভিজ্ঞতা ও অবশ্যই জাত দেখে। মূলত বয়জেষ্ঠ্য ও অভিজ্ঞ মহিলাকর্মীরা নিযুক্ত হত ঠাকুরঘর ও পাকশালার কার্যে, অপেক্ষাকৃত নবীন ও অবিবাহিত ঝি-রা মূলত বাড়ির মেয়ে-বউদের পরিচর্যা ও পুরুষ মনিবের ফাইফরমাস খাটার কাজে ব্রত হত। হানসেনের মতে মনিব ও তার ঝি-এর সম্পর্ক মূলত "psycho-sexual power relationship" (২২)। অর্থাৎ বলা চলে মহিলা সাহায্যকারীদের ক্ষেত্রে কেবল তাদের কায়িক পরিশ্রম তাদের বেতন যোগাড়ের জন্য যথেষ্ট ছিলনা বরং তাদের নিজেদের শরীর দিয়ে মনিবের চাহিদাও মিটিয়ে চলতে হত। তবে এই যৌনসুখ প্রাপ্তির পরেও মালিকের লেগে থাকত যৌনরোগ দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা এবং ফলস্বরূপ বহু মহিলা সাহায্যকর্মীকে কেবল সন্দেহের বশে তাদের কাজ থেকে বহিস্কৃতও করা হত। অপরদিকে এই "psycho-sexual power relationship" খাটিয়ে আফ্রিকায় কালো চামড়ার মেয়েদের এবং বাংলায় দলিত কিংবা সাঁওতাল সহ অন্য ট্রাইবাল মহিলাদের উপর নিজেদের পুরুষত্ব এবং ক্ষমতা দেখিয়ে মজা পেয়ে এসেছে তামাম পুরুষ মালিকরা। তাই লন্ডনেও ঘরছাড়া মহিলারা ও সমাজ যাদের বেশ্যা বলে দাগিয়ে দিয়েছে তারাই পরবর্তীতে "domestic-help" হিসাবে কাজে যোগদান করে। (টেলিস-নায়াক, ৭১)

চাকর ও মনিবের সম্পর্ক এবং অবস্থানগত বিভেদ:

চাকর ও মনিব সেই অর্থে একে অন্যের পরিপূরক হলেও তাদের মধ্যেকার দুরত্ব আগাগোড়াই রয়ে গেছে। এই সম্পর্কের অভিমুখ তাই সর্বদাই একমুখী ছিল অর্থাৎ বলা চলে চাকর একতরফা তার মনিবের জন্য কাজ করে যেত এবং মনিবের তার চাকরের প্রতি ব্যবহার ছিল তার নিজস্ব অবস্থান ও অবস্থাঙ্গত ক্ষমতার প্রতিমূর্তি। তাদের সম্পর্কের যে পদানুক্রম তা সর্বদাই বিরাজমান এবং তা বজায় রাখতে সর্বদাই মালিকের তৎপরতাই বেশি এবং এই সম্পর্কের অভ্যন্তরীণ এই পদানুক্রম বজায় রাখার জন্য মনিবেরা তাদের ভৃত্যদের প্রতি ব্যবহৃত ভাষা, শব্দ, তাদের প্রতি করা ব্যবহার, অনুভূত অনুভূতি, তাদের বেশভূষা প্রভৃতির একটি বিকৃত প্রতিলিপি তৈরি করে চলেছে আজও। উনিশ শতক কিংবা বিংশ শতকের মনিবদের যখনই তাদের ভৃত্যদের আদেশ দেওয়ার বা কোন বার্তা প্রদান করার প্রয়োজন হয়েছে, তারা সম্বোধন করেছে "তুই" বলে। এই সম্বোধন লিঙ্গ কিংবা বয়স কোনটির ধার না ধেরে সকলের জন্যই প্রযোজ্য ছিল। অর্থাৎ বলা চলে এই সম্বোধনের ক্ষেত্রে একধরণের সমতা রয়েছিল। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে প্রবীণ ব্রাহ্মণ ঠাকুরকে বাকি চাকররা ঠাকুর কিংবা "মহারাজ" (শ্রীনিবাস, ২৭৫) বলে ডাকলেও, মনিবের কাছে তার পরিচয় ছিল রাঁধুনি। অর্থাৎ তার কাজটাই তার নামের প্রতিরূপ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এমনকি কখনো কখনো ঝি-চাকরদের মনিবেরা নিজেদের স্বেচ্ছামতন তাদের নামকরণ করত এবং এই নাম মোটের উপর তাদের কাজের অবস্থান, শারীরিক গঠন, সামাজিক অবস্থান আবার কখনো কখনো তাদের ব্যক্তিগত কোন ঘটনার জের টেনেও নাম রাখা হত। ধরা যাক কোনো মহিলা সাহায্যকর্মী সন্তানপ্রসাবে অপারক তবে অন্তরমহলে তার নাম 'বাঝা-ঝি' রাখা হত এবং তাকে মালিকের সন্তানের কোন দায়িত্ব দেওয়া হত না। মনিব তার সনাতন নামের একজন চাকর, যে সম্প্রতি হয়তো পিতা-মাতা হারা হয়েছে, তাকে অনাথন বলে ডাকতে দ্বিধাবোধ করতেন না এবং এই মশকরার মধ্যে দিয়ে মনিব কিরূপ হাস্যকৌতুকে পটু এবং নিজের চাকরদের উপর তার কি দারুণ অধিকার আছে তার পরিচয় সে তার বন্ধু ও পরিচিতদের দিতেন। বাবু সম্প্রদায়ের সদ্য ইংরাজী শেখা বাবুরা তাদের বাড়িতে আসা ব্রিটিশ কিংবা অ্যাংলো বন্ধু ও অতিথিদের সাথে

ইংরাজীতে কথা বলার সময় তাদের নিজেদের ভৃত্যদের ডেকে অনেকসময় ইংরাজীতে তাদের প্রতি কথা বলে তাদের অবুঝ উত্তর পেয়ে তা নিয়ে মজা করতেন এবং তারপর তাদের সাথে বাংলা বা তাদের বোধগম্য ভাষায় কথা বলে নিজেদের পাণ্ডিত্য জাহির করতেন।

ভৃত্যদের প্রতি ব্যবহৃত ভাষা ও তাদের প্রতি মনিবের কৃত ব্যবহারের বাইরে গিয়েও সমাজ ও অবশ্যই মালিক আরও কিছু বাঁধাধরা নিয়ম বা "stereotypes" ঠিক করে রেখেছিল আগাগোড়াই। তার মধ্যে মানুষের প্রাথমিক তিনটি প্রয়োজনীয়তা অর্থাৎ অন্ন, বস্ত্র ও বাসস্থানের প্রতি কিছু আরোপিত বাঁধা-নিষেধ নিয়ে এবার কথা বলা যাক। চাকররা নিয়মানুযায়ী খাওয়ার খেত সকলের শেষে এবং তাদের খাওয়ার বাসন, জলের গ্লাস এমনকি কোনো কোনো গৃহস্থালিতে পাকশালাও আলাদা ছিল এবং খাওয়ার পদও ছিল পরিবারের সকলের চেয়ে ভিন্ন। কখনো কখনো মালিকের খেয়ে খাওয়ার অবশিষ্ট থাকলে তা বাড়ির ভৃত্যদের মধে ভাগ করে দেওয়া হত। মালিকের চোখের আড়ালে গিয়ে কিংবা বাড়ির বাইরের ঘরে বসে আত্রা তাদের খাওয়ার খেত নিশব্দে। তাদের পায়ে জুত পড়ার অনুমতি ছিলনা এবং বিশেষ কার্যক্ষেত্রে যেমন গাড়িচালক, দাড়োয়ান, কখনো কখনো খাওয়ার পরিবেশনকারীদের জন্য আলাদা পোষাক বানানো হত যাতে তাকে সহজে চিহ্নিত করা যায় এবং সে ঐ একই গাড়িতে বসলেও মালিকের থেকে আলাদা সেই সম্পর্কে তাকে সচেতন করা হত। মালিক ও তার পরিবার-পরিজন তাদের ব্যবহৃত কাপড় ভৃত্যদের ব্যবহার করতে দিয়ে খানিক নিশ্চিন্তে গালে পান দিয়ে নিজেদের উদারতার বড়াই করত। বাড়ির ভৃত্যদের থাকার ব্যবস্থা হত সাধারণত নীচতলার বারান্দায়, কলঘরের পাশে কিংবা সিঁড়িঘরের মেঝেতে। তাদের নিজিস্ব কোন ঘর সাধারণত ছিল না। অর্থাৎ মালিকের তলায় যে তার অবস্থান তা কেবল তার কাজের মাধ্যমে নয় বরং দোতলায় মালিকের শোয়ার ঘরের নীচের ঘরে কিংবা বারান্দার মেঝেতে তার শয়নের জোগাড় করার সময়ও তাকে মনে করিয়ে দেওয়া হত যে তার অবস্থান তার মালিকের অবস্থানের তলায় অর্থাৎ বেশ নীচুতে: "The message is clear, the domestic's place is at the bottom in the family hierarchy as well as the social hierarchy." (রলিনস, ১৭২)

চাকরের আদর্শ, প্রেম ও বন্ধুত্ব: একটি উপসংহার

শেক্সপিয়ার কিংবা শেরিডনের নাটকে চাকরদের সাধারণত এমনভাবে পুনরুস্থাপন করা হয়েছে তারা যেন কৌতুকের পাত্র। তাদের কথাবার্তা মূলত প্রধান চরিত্রেদের দর্শকের সাথে পরিচয় করে দেওয়ার জন্য কিংবা ঘটনার ঘনঘটায় হাস্যরস যোগ করে নাটকের গভীর প্লটে খানিক লঘুতা আনার জন্য ব্যবহার করা হয়। চাকরের জীবনকে কেবল সাহিত্যের পাতায় নয় বরং বিনোদন জগতেও একপ্রকার কৌতুকময় করে তোলা হয় বিভিন্ন উপাদান সহযোগে। এইক্ষেত্রে তিনটি ভিন্ন সময়ের তিনটি বাংলা ছায়াছবিতে চাকরের উপস্থাপনা বিষয়ক বিশেষ টিপ্পনি করা যাক। মহানায়ক উত্তমকুমার, তনুজা, ছায়া দেবী, পাহাড়ী সান্যাল, কমল মিত্র, নৃপতি চট্টোপাধ্যায় অভিনীত এবং সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায় পরিচালিত ছায়াছবি 'দেয়া-নেয়া' তে উত্তমকুমারের তিনটি চারিত্রিক উপস্থাপনার মধ্যে হৃদয়হরণ বি.এ পাশের গুরুত্ব এই লেখনীর ক্ষেত্রে যথেষ্ঠ। প্রশান্ত একজন গাড়িচালক জেনে সুচরিতার বাবা কখনই তাঁর সাথে সুচরিতার বিয়ে দিতে চাননি কিন্তু যখন জানতে পারেন যে তিনি চালক তো ননই বরং বিখ্যাত গায়ক ও একইসাঘে একটি প্রতিপত্তিশালী পরিবারের একমাত্র ছেলে, তখন আর সুচরিতার বিয়ে দিতে তিনি অমত করলেন না। অপর দিকে গায়ক অভিজিতের কেবল গান শুনে প্রেম পরলেও, সুচরিতা কখনই চালক হৃদয়হরণের মনের হদিশ করেননি কারণ চাকর ও মনিবের প্রেম চলে না এবং চাকরের প্রেম নিতান্তই কৌতুক সমতুল্য। অপরদিকে সুভাষ সেন পরিচালিত 'পূজা' চলচ্চিত্রে, চুমকি চৌধুরী অভিনীত পূজা চরিত্রটি বাড়ির ঝি। সে যখন শোনে তাঁর মনিবের মেয়ে

ময়নাকে তাঁর শ্বশুরবাড়ির মানুষজন পণ দিতে না পারার কারণে নিত্য জ্বালা-যন্ত্রনা দিচ্ছে, তখন সে তাঁর 'রেবেল' রূপে হাজির হয় সেই বাড়িতে। এরপর গল্প এগোলে তাঁর সাথে সেই বাড়ির ছোট ছেলের (টোটা রায়চৌধুরী অভিনীত) বিবাহ হয়। এক্ষেত্রে আবার চাকর ও মনিব স্থানীয় ব্যক্তির অন্য এক প্রেমের গল্প চোখে পরে। অপরদিকে ২০০৯ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত, জিত, কোয়েল, রঞ্জিত মল্লিক, লকেট, লাবণী, শুভাশিষ, মোনালিসা অভিনীত এবং সুজিত মন্ডল পরিচালিত 'সাত পাঁকে বাঁধা' ছবিতে শুভাশিষ জিতের বাড়ির কাজের লোক, অফিসে পি.এ এবং একইসাথে বন্ধুও। সে সর্বদাই তাঁর বন্ধুস্থানীয় মনিব কিংবা 'বসের' সাহায্য করে ও উপযুক্ত বুদ্ধি দেয়। এক্ষেত্রে মনিব-চাকরের বন্ধুত্বের প্রতিচ্ছবি পাওয়া যায়।

আবার *স্বর্ণলতা*-র মতন উপন্যাসে কখনো কখনো বাড়ির ঝি হয়ে ওঠে গোপালের (মালিকের সন্তানের) আরেক মা। সে মালিকের পরিবারের তার জমানো বেতন তুলে দেয় তার মালিকের হাতে। হানসেনের ভাষায়: "The literary writer's servant is there in an active variety: as a loyal tool, mercenary opportunist, active agent, distributer of the social order, representative of the rising bourgeoisie, fortuner of the revolution." (22) আবার গোয়েন্দা উপন্যাসে দেখা যায় বাড়ির প্রয়োজনীয় কিছু জিনিস চুরি গেলে তার দায় প্রথমত এসে পড়ে বাড়ির ভৃত্যের উপর। পুলিশি জেরা ও চোর বদনাম প্রাপ্ত বাড়ির ভৃত্যকে অন্য কাজ খুঁজতে যেতে হয়। অপরদিকে বাড়ির লোককে খুঁজতে হয় আরেকজন চাকর কিন্তু তা সত্ত্বেও মনের মতন আদর্শ চাকর বা "ideal domestic workers" (গুপ্ত, ১৪৫) পাওয়া হয়ে ওঠেনা। তাই আজও বাঙালি রবি ঘোষ অভিনীত এবং তপন সিনহা পরিচালিত 'গল্প হলেও সত্যি' সিনেমা দেখে হাঁ-পিত্তেশ করে আর ধনঞ্জয়ের মতন চাকরের দিন গোনে। তবে এই আর্দশ চাকরের কি কি গুণ থাকা দরকার তা বিশ্লেষণ করতে হলে আমাদের ফিরে যেতে হবে এই লেখনীর "কর্মচারী, ভৃত্য ও তাদের অবস্থানগত বিভেদ ও বিরোধ" অংশে উল্লেখিত সেই সকল শর্তাবলিতে। অর্থাৎ গল্প হলেও সত্যি সিনেমার রবি ঘোষকেও কেবল সব কাজে নিপুণ কিংবা সংসারের অভ্যন্তরীণ সমস্যা মিটিয়ে দিয়ে চলে গেলে হবেনা। তাঁকেও অবশ্যম্ভাবী ভাবে প্রভূত শর্তাবলির তোয়াক্কা করতে হবে।

তবে উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে এই পেশা বহু মানুষের মুখে ভাত জুগিয়ে চলেছে। ঘরছাড়া বহু মানুষ ও অল্পশ্যিক্ষিত মহিলাদের নিজের রোজগারের সন্ধান করে দিয়েছে এই পেশা। ইংরাজী শব্দ "servant", "maid-servant" কিংবা বাংলা শব্দ ভৃত্য, ঝি-চাকর প্রভৃতি আজ আর ব্যবহৃত হয়না। বরং শব্দের অর্থগত ও মানগত পরিবর্তন হয়ে বর্তমানে তা "househelp" বা গৃহস্থালীর কাজে সাহায্যকারী হিসাবে ব্যবহৃত হয়। আজ আর এত শর্তাবলির ঘেরাটোপ না থাকলেও এক অলিখিত আইন যেন তৈরি হয়ে রয়েছে, যা মনিব ও চাকর উভয়ই জেনে বা নিজের অজান্তে পালন করে চলেছে। তাই আজও হয়ত তাদের পরিচয় কর্মচারী নয় বরং সাহায্যকর্মী।

তথ্যসূত্র:

১। গিল, লেসলি। পেইন্টেড ফেসেস: কনফ্লিক্ট এন্ড এম্বিগুইটি ইন ডমেস্টিক সার্ভেন্ট-এমপ্লইয়ার রিলেশনস ইন লা পাজ। লাতিন আমেরিকান রিসার্চ রিভিউ, ১৯৩০-১৯৮৮।

২। গুপ্ত, চারু। ডমেস্টিক অ্যাংসাইটিস, রিক্যালসিট্রান্ট ইন্টিমেসিসঃ রিপ্রেসেন্টেশন অফ সার্ভেন্টস ইন হিন্দি প্রিন্ট কালচার অফ কলোনিয়াল ইন্ডিয়া। স্টাডিস ইন হিস্টোরি। সেজ পাবলিকেশন, ২০১৮।

৩।কক, জ্যাকলিন। মেইডস এন্ড ম্যাডামস: এ স্টাডি অফ দ্য পলিটিকস অফ এক্সপ্লয়টেশন। কর্ণেল ইউওনিভার্সিটি প্রেস, জোয়ানেসবার্গ, ১৯৮০।

৪। কৈই-হেঁ টি-প্ল্যান্টার্স আসাম, দার্জিলিং এন্ড নর্থ-ইস্ট ইন্ডিয়া। ফেসবুক পেইজ, ২০১৯। www.koi-hain.com

৫। চ্যাপলিন, ডেভিড। ডমেস্টিক সার্ভিস এন্ড ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইসেশন: কম্পারেটিভ স্টাডি অফ সোশিওলজি । ১৯৭৮।

৬। টসিগ মাইকেল, অ্যান রাব্বো। আপ অফ দেয়ার নিস: সার্ভেন্টহুড ইন সাউথ-ওয়েস্ট কলম্বিয়া। ১৯৮৩।

৭। টেলিস-নায়াক, ভি। পাওয়ার এন্ড সলিডিটারিঃ ক্লিনটেজ ইন ডোমেস্টিক সার্ভিস। কারেন্ট এনথোপলজিন। সংখ্যা ২৩, ১৯৮৩।

৮। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। জীবনস্মৃতি। বিশ্বভারতী, ২০০৮।

৯। ডেভিডফ, লিওনর। মাস্ট্রার্ড ফর লাইফ: সার্ভেন্ট এন্ড ওয়াইফ ইন ভিক্টোরিয়ান এন্ড এডওয়ার্ডিইয়ান ইংল্যান্ড। জার্নাল অফ সোশ্যাল হিস্টরি।

১০। দ্য সার্ভেন্ট প্রবলেম। দ্য ইকোনমিস্ট। মার্চ ১৭, ১৯৯০।

১১। ম্যাক্মিলান, মার্গারেট। ওমেন অফ দ্য রাজ। টেমস এন্ড হাডসন, লন্ডন, ১৯৮৬।

১২। রলিনস, জুডিথ। বিটউইন ওম্যান: ডমেস্টিকস এন্ড দেয়ার এমপ্লয়ারস। টেম্পেল ইউনিভার্সিটি প্রেস, ফিলাদেলফিয়া, ১৯৮৫।

১৩। রায়, রাকা এবং কইয়াম, সিমিন। কালচারস অফ সার্ভিটিউড: মর্ডানিটি, ডমেটিসিটি এন্ড ক্লাস ইন ইন্ডিয়া। অক্সফোর্ড ইউওনিভার্সিটি প্রেস, ২০১০।

১৪। শ্রীনিবাস, লক্ষ্মী। মাস্টারস সার্ভেন্ট রিলেশনশিপ ইন এ ক্রস-কালচারাল পার্স্পেক্টিভ। ইকোনমিক এন্ড পলিটিক্যাল উইকলি। ফেব্রুয়ারি ৪, ১৯৯৫।

১৫। হানসেন, কারেণ ট্রানবার্গ। ডিস্ট্যান্ট কম্পেনিয়নস: সার্ভেন্টস এন্ড এমপ্লয়ার্স ইন জোম্বিয়া। কর্নেল ইউনিভার্সিটি প্রেস, ইথাকা, ১৯৮৯।